প্রবন্ধ

বাহুবল ও বাক্যবল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

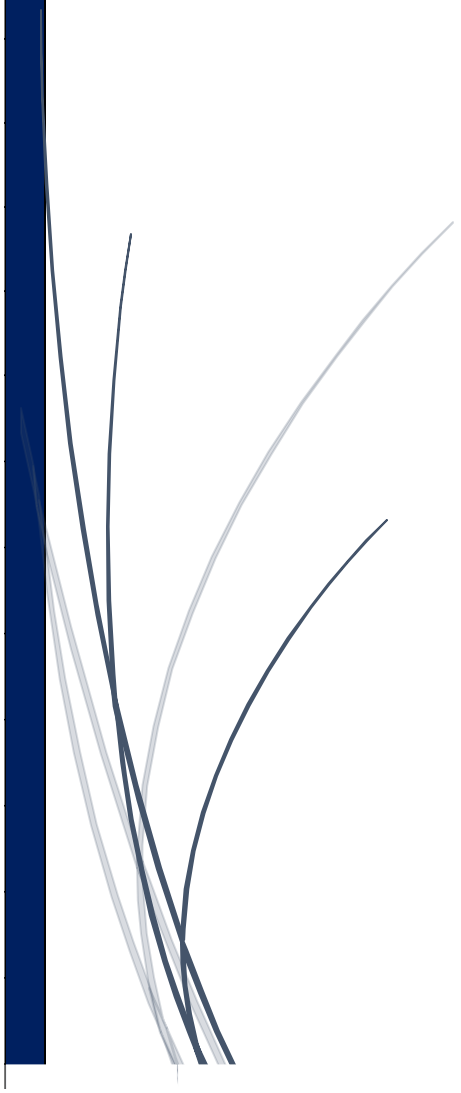

BENGALIEBOOK.COM
2021

বাহুবল ও বাক্যবল*

সামাজিক দুঃখ নিবারণের জন্য দুইটি উপায় মাত্র ইতিহাসে পরিকীর্ত্তিত—বাহুবল ও বাক্যবল। এই দুই বল সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার পূর্ব্বে সামাজিক দুঃখের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

মনুষ্যের দুঃখের কারণ তিনটি। (১) কতকগুলি দুঃখ জড়পদার্থের দোষগুণঘটিত। বাহ্য জগৎ কতকগুলি নিয়মাধীন হইয়া চলিতেছে; কতকগুলি শক্তিকর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে। মনুষ্যও বাহ্য জগতের অংশ; সুতরাং মনুষ্যও সেই সকল শক্তিকর্ত্তৃক শাসিত। নৈসর্গিক নিয়মসকল উল্লঙ্ঘন করিলে রোগাদিতে কষ্ট ভোগ করিতে হয়, ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইতে হয়, এবং নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক দুঃখভোগ করিতে হয়।

(২) বাহ্য জগতের ন্যায় অন্তর্জগৎও আরও একটি মনুষ্যদুঃখের কারণ। কেহ পরশ্রী দেখিয়া সুখী, কেহ পরশ্রীতে দুঃখী। কেহ ইন্দ্রিয়সংযমে সুখী, কাহারও পক্ষে ইন্দ্রিয়সংযম ঘোরতর দুঃখ। পৃথিবীর কাব্যগ্রন্থসকলের, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দুঃখই আধার।

(৩) মনুষ্যদুঃখের তৃতীয় মূল, সমাজ। মনুষ্য সুখী হইবার জন্য সমাজবদ্ধ হয়; পরস্পরের সহায়তায় পরস্পরের অধিকতর সুখী হইবে বলিয়া, সকলে মিলিত হইয়া বাস করে। ইহাতে বিশেষ উন্নতিসাধন হয় বটে, কিন্তু অনেক অমঙ্গলও ঘটে। সামাজিক দুঃখ আছে। দারিদ্র্য দুঃখ সামাজিক দুঃখ। যেখানে সমাজ নাই, সেখানে দারিদ্র্য নাই।

কতকগুলি সামাজিক দুঃখ, সমাজ সংস্থাপনেরই ফল-যথা দারিদ্র্য। যেমন আলো হইলে, ছায়া তাহার আনুষঙ্গিক ফল আছেই আছে—তেমনি সমাজবদ্ধ হইলেই দারিদ্র্যাদি কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছেই আছে।# এ সকল সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ কখনও সম্ভবে না। কিন্তু আর কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছে, তাহা সমাজের নিত্যফল নহে; তাহা নিবার্য্য, এবং তাহার উচ্ছেদ সামাজিক উন্নতির প্রধান অংশ। সামাজিক মনুষ্য সেই সকল সামাজিক দুঃখের তাহার উচ্ছেদজন্য বহুকাল হইতে চেষ্টিত। সেই চেষ্টার সভ্যতার

ইতিহাসের প্রধান অংশ, এবং সমাজনীতি ও রাজনীতি, এই দুইটি শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এই দ্বিবিধ সামাজিক দুঃখ, আমি কয়েকটি উদাহরণের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। স্বাধীনতার হানি, একটি দুঃখ সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজে বাস করিলে অবশ্যই স্বাধীনতার ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে, যতগুলি মনুষ্য সমাজসম্ভুক্ত, আমি সমাজে বাস করিয়া, ততগুলি মনুষ্যেরই কিয়দংশে অধীন—এবং সমাজের কর্ত্তৃগণের বিশেষ প্রকারে অধীন। অতএব স্বাধীনতার হানি একটি সামাজিক নিত্যদুঃখ।

———

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৪, জ্যৈষ্ঠ।

আলোকছায়ার উপমাটি সম্পূর্ণ ও শুদ্ধ। ইহা সত্য যে, এমত জগৎ আমরা মনোমধ্যে কল্পনা করিতে পারি যে, সে জগতে আলোকদায়ী সূর্য্য ভিন্ন আর কিছুই নাই—সুতরাং আলোক আছে, ছায়া নাই। তেমনি আমরা এমন সমাজ মনে মনে কল্পনা করিতে পারি যে, তাহাতে সুখ আছে—দুঃখ নাই। কিন্তু এই জগৎ আর এই সমাজ কেবল মনঃকল্পিত, অস্তিত্বশূন্য।

———

স্বানুবর্ত্তিতা একটি পরম সুখ। স্বানুবর্ত্তিতার ক্ষতি পরম দুঃখ। জগদীশ্বর আমাদিগকে যে সকল শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তি দিয়াছেন, তাহার স্ফূর্ত্তিতেই আমাদের মানসিক ও শারীরিক সুখ। যদি আমাকে চক্ষু দিয়া থাকেন, তবে যাহা কিছু দেখিবার আছে, তাহা দেখিয়াই আমার চাক্ষুষ সুখ। চক্ষু পাইয়া যদি আমি চক্ষু চিরমুদ্রিত রাখিলাম—তবে চক্ষু সম্বন্ধে আমি চিরদুঃখী। যদি আমি কখনও কখনও বা কোন কোন বস্তুসম্বন্ধে চক্ষু মুদ্রিত করিতে বাধ্য হইলাম—দৃশ্য বস্তু দেখিতে পাইলাম না—তবে আমি কিয়দংশে চক্ষু সম্বন্ধে দুঃখী। আমি বুদ্ধিবৃত্তি পাইয়াছি—বুদ্ধির স্ফূর্ত্তিই আমার সুখ। যদি আমি বুদ্ধির মার্জ্জনে ও স্বেচ্ছামত পরিচালনে চিরনিষিদ্ধ হই, তবে বুদ্ধিসম্বন্ধে আমি চিরদুঃখী। যদি বুদ্ধির পরিচালনে আমি কোন দিকে নিষিদ্ধ হই, তবে আমি সেই পরিমাণে বুদ্ধিসম্বন্ধে চিরদুঃখী।

সমাজে থাকিলে সেই সকল দৃশ্য বস্তু দেখিতে পাই না—সকল দিকে বুদ্ধি পরিচালনা করিতে পাই না। মনুষ্য কাটিয়া বিজ্ঞান শিখিতে পাই না—অথবা রাজপুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া দিদৃক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে পারি না। এগুলি সমাজের মঙ্গলকর হইলেও, স্বানুবর্তিতার নিষেধক বটে। অতএব এগুলি সামাজিক নিত্যদুঃখ।

দারিদ্র্যের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অসামাজিক অবস্থায় কেহই দরিদ্র নহে-বনের ফলমূল, বনের পশু, সকলেরই প্রাপ্য; নদীর জল, বৃক্ষের ছায়া, সকলেরই ভোগ্য। আহার্য্য, পেয়, আশ্রয়, শরীরধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয়, তাহার অধিক কেহ কামনা করে না, কেহ আবশ্যকীয় বিবেচনা করে না, কেহ সংগ্রহ করে না। অতএব একের অপেক্ষা অন্যে ধনী নহে, একের অপেক্ষা অন্যে কাজে কাজেই দরিদ্র নহে | কাজে কাজেই অসামাজিক অবস্থা দারিদ্র্যশূন্য। দারিদ্র্য তারতম্যঘটিত কথা; সে তারতম্য সামাজিকতার নিত্যফল। দারিদ্র্য সামাজিকতার নিত্য কুফল।

সামাজিকতার এই এক জাতীয় ফল। যতদিন মনুষ্য সমাজবদ্ধ থাকিবে, ততদিন এ সকল ফল নিবার্য্য নহে। কিন্তু আর কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছে, তাহা অনিত্য এবং নিবার্য্য। এদেশে বলে, বিধবাগণ যে বিবাহ করিতে পারে না, ইহা সামাজিক কুপ্রথা, সামাজিক দুঃখ—নৈসর্গিক নহে। সমাজের গতি ফিরিলেই এ দুঃখ নিবারিত হইতে পারে। হিন্দুসমাজ ভিন্ন অন্য সমাজে এ দুঃখ নাই। স্ত্রীগণ যে সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারে না, ইহা বিলাতী সমাজের একটি সামাজিক দুঃখ; ব্যবস্থাপক সমাজের লেখনীনির্গত এক ছত্রে ইহা নিবার্য্য, অনেক সমাজে এ দুঃখ নাই। ভারতবর্ষীয়েরা যে স্বদেশে উচ্চতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে না, ইহা আর একটি নিবার্য্য সামাজিক দুঃখের উদাহরণ।

যে সকল সামাজিক দুঃখ নিত্য ও অনিবার্য্য, তাহারও উচ্ছেদের জন্য মনুষ্য যত্নবান্ হইয়া থাকে। সামাজিক দরিদ্রতা নিবারণ জন্য যাহারা চেষ্টিত, ইউরোপে, সোশিয়ালিষ্ট্, কম্যুনিষ্ট্ প্রভৃতি নামে তাহারা খ্যাত। স্বানুবর্তিতার সঙ্গে সমাজের যে বিরোধ, তাহার লাঘব জন্য, মিল্ "Liberty" নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন-অনেকের কাছে এই গ্রন্থ দৈবপ্রসাদ বাক্যস্বরূপ গণ্য। যাহা অনিবার্য্য, তাহার নিবারণ সম্ভবে না; কিন্তু অনিবার্য্য দু:খও মাত্রায় কমান যাইতে পারে। যে রোগ সাংঘাতিক, তাহাও চিকিৎসা

আছে-যন্ত্রণা কমান যাইতে পারে। সুতরাং যাঁহারা সামাজিক নিত্য দুঃখ নিবারণের চেষ্টায় ব্যস্ত, তাঁহাদিগকে বৃথা পরিশ্রমে রত মনে করা যাইতে পারে না।

নিত্য এবং অপরিহার্য্য সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ সম্ভবে না, কিন্তু অপর সামাজিক দুঃখগুলির উচ্ছেদ সম্ভব এবং মনুষ্যসাধ্য। সেই সকল দুঃখ নিবারণ জন্য মনুষ্যসমাজ সর্ব্বদাই ব্যস্ত। মনুষ্যের ইতিহাস সেই ব্যস্ততার ইতিহাস।

বলা হইয়াছে, সামাজিক নিত্য দুঃখসকল, সমাজ সংস্থাপনেরই অপরিহার্য্য ফল—সমাজ হইয়াছে বলিয়াই সেগুলি হইয়াছে। কিন্তু অপর সামাজিক দুঃখগুলি কোথা হইতে আইসে? সেগুলি সমাজের অপরিহার্য্য ফল না হইয়াও কেন ঘটে? তাহার নিবারণ পক্ষে, এই প্রশ্নের মীমাংসা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

এগুলি সামাজিক অত্যাচারজনিত। বোধ হয়, প্রথমে অত্যাচার কথাটি বুঝাইতে হইবে—নহিলে অনেকে বলিতে পারিবেন, সমাজের আবার অত্যাচার কি? শক্তির অবিহিত প্রয়োগকে অত্যাচার বলি। দেখ, মাধ্যাকর্ষণাদি যে সকল নৈসর্গিক শক্তি, তাহা এক নিয়মে চলিতেছে, তাহার কখনও আধিক্য নাই, কখনও অল্পতা নাই; বিধিবদ্ধ অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মে তাহা চলিতেছে। কিন্তু যে সকল শক্তি মানুষের হস্তে তাহার এরূপ স্থিরতা নাই। মনুষ্যের হস্তে শক্তি থাকিলেই, তাহার প্রয়োগ বিহিত হইতে পারে এবং অবিহিত হইতে পারে। যে পরিমাণে শক্তির প্রয়োগ হইলে উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হইবে, অথচ কাহারও কোন অনিষ্ট হইবে না, তাহাই বিহিত প্রয়োগ। তাহার অতিরিক্ত প্রয়োগ অবিহিত প্রয়োগ। বারুদের যে শক্তি, তাহার বিহিত প্রয়োগে শত্রুবধ অবিহিত প্রয়োগে কামান ফাটিয়া যায়। শক্তির এই অতিরিক্ত প্রয়োগই অত্যাচার।

মনুষ্য শক্তির আধার। সমাজ মনুষ্যের সমবায়, সুতরাং সমাজও শক্তির আধার। সে শক্তির বিহিত প্রয়োগে মনুষ্যের মঙ্গল—দৈনন্দিন সামাজিক উন্নতি। অবিহিত প্রয়োগে সামাজিক দু:খ। সামাজিক শক্তির সেই অবিহিত প্রয়োগ, সামাজিক অত্যাচার।

কথাটি এখনও পরিষ্কার হয় নাই। সামাজিক অত্যাচার ত বুঝা গেল, কিন্তু কে অত্যাচার করে? কাহার উপর অত্যাচার হয়? সমাজ মনুষ্যের সমবায়। এই সমবেত মনুষ্যগণ কি আপনাদিগেরই উপর অত্যাচার করে? অথবা পরস্পরের রক্ষার্থে যাহারা

সমাজবদ্ধ হইয়াছে, তাহারাই পরস্পরে উৎপীড়ন করে? তাই বটে, অথচ, ঠিক তাই নহে। মনে রাখিতে হইবে, যে, শক্তিরই অত্যাচার; যাহার হাতে সামাজিক শক্তি, সেই অত্যাচার করে। যেমন গ্রহাদি জড়পিণ্ডমাত্রের মাধ্যাকর্ষণশক্তি কেন্দ্রনিহিত, তেমনি সমাজেরও একটি প্রধান শক্তি, কেন্দ্রনিহিত। সেই শক্তি—শাসনশক্তি; সামাজিক কেন্দ্র—রাজা বা সামাজিক শাসনকর্ত্তৃগণ। সমাজরক্ষার জন্য, সমাজের শাসন আবশ্যক। সকলেই শাসনকর্ত্তা হইলে, অনিয়ম এবং মতভেদ হেতু শাসন অসম্ভব। অতএব শাসনের ভার, সকল সমাজেই এক বা ততোধিক ব্যক্তির উপর নিহিত হইয়াছে। তাঁহারাই সমাজের শাসনশক্তিধর—সামাজিক কেন্দ্র। তাঁহারাই অত্যাচারী। তাঁহারা মনুষ্য; মনুষ্যমাত্রেরই ভ্রান্তি এবং আত্মাদর আছে। ভ্রান্ত হইয়া তাঁহারা সেই সমাজপ্রদত্ত শাসনশক্তি, শাসিতব্যের উপরে অবিহিত প্রয়োগ করেন। আত্মাদরের বশীভূত হইয়াও তাঁহারা উহার অবিহিত প্রয়োগ করেন।

তবে এক সম্প্রদায় সামাজিক অত্যাচারীকে পাইলাম। তাঁহারা রাজপুরুষ-অত্যাচারের পাত্র সমাজের অবশিষ্টাংশ। কিন্তু বাস্তবিক এই সম্প্রদায়ের অত্যাচারী কেবল রাজা বা রাজপুরুষ নহে। যিনিই সমাজের শাসনকর্ত্তা, তিনিই এই সম্প্রদায়ের অত্যাচারী। প্রাচীন ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণ, রাজপুরুষ বলিয়া গণ্য হয়েন না, অথচ তাঁহারা সমাজের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। আর্য্যসমাজকে তাঁহারা যে দিকে ফিরাইতেন ঘুরাইতেন, আর্য্যসমাজ সেই দিকে ফিরিত ঘুরিত। আর্য্যসমাজকে তাঁহারা যে শিকল পরাইতেন, অলঙ্কার বলিয়া আর্য্যসমাজ সেই শিকল পরিত। মধ্যকালিক ইউরোপের ধর্ম্মযাজকগণ সেইরূপ ছিলেন—রাজপুরুষ নহেন, অথচ ইউরোপীয় সমাজের শাসনকর্ত্তা, এবং ঘোরতর অত্যাচারী। পোপগণ ইউরোপের রাজা ছিলেন না, এক বিন্দু ভূমির রাজা মাত্র, কিন্তু তাঁহারা সমগ্র ইউরোপের উফর ঘোরতর অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন। গ্রেগরি বা ইনোসেণ্ট্, লিও বা আদ্রিয়ান্ ইউরোপে যতটা অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন, দ্বিতীয় ফিলিপ্ বা চতুর্দ্দশ লুই, অষ্টম হেন্‌রী বা প্রথম চার্লস্ ততদূর করিতে পারেন নাই।

কেবল রাজপুরুষ বা ধর্ম্মযাজকের দোষ দিয়া ক্ষান্ত হইব কেন? ইংলণ্ডে এক্ষণে রাজা (রাজ্ঞী) কোন প্রকার অত্যাচারে ক্ষমতাশালী নহেন—শাসনশক্তি তাঁহার হস্তে নহে। এক্ষণে

প্রকৃত শাসনশক্তি ইংলণ্ডে সংবাদপত্রগলেখকদিগের হস্তে। সুতরাং ইংলণ্ডের সংবাদলেখকগণ অত্যাচারী। যেখানে সামাজিক শক্তি, সেইখানেই সামাজিক অত্যাচার।

কিন্তু সমাজের কেবল শাসনকর্ত্তা এবং বিধাতৃগণ অত্যাচারী, এমত নহে। অন্য প্রকার সামাজিক অত্যাচারী আছে। যে সকল বিষয়ে রাজ্যশাসন নাই, ধর্ম্মশাসন নাই, কোন প্রকার শাসনকর্ত্তার শাসন নাই—সে সকল বিষয়ে সমাজ কাহার মতে চলে? অধিকাংশের মতে। যেখানে সমাজের এক মত, সেখানে কোন গোলই নাই—কোন অত্যাচার নাই। কিন্তু এরূপ ঐক্যমত অতি বিরল। সচরাচরই মতভেদ ঘটে। মতভেদ ঘটিলে, অধিকাংশের যে মত, অল্পাংশকে সেই মতে চলিতে হয়। অল্পাংশ ভিন্নমতাবলম্বী হইলেও, অধিকাংশের মতানুসারে কার্য্যকে ঘোরতর দুঃখ বিবেচনা করিলেও, তাহাদিগকে অধিকাংশের মতে চলিতে হইবে। নহিলে অধিকাংশ অল্পাংশকে সমাজবহিষ্কৃত করিয়া দিবে—বা অন্য সামাজিক দণ্ডে পীড়িত করিবে। ইহা ঘোরতর সামাজিক অত্যাচার। ইহা অল্পাংশের অত্যাচার বলিয়া কথিত হইয়াছে।

এদেশে অধিকাংশের মত যে, কেহ হিন্দুবংশজ হইয়া বিধবার বিবাহ দিতে পারিবে না বা কেহ হিন্দুবংশজ হইয়া সমুদ্র পার হইবে না। অল্পাংশের মত, বিধবার বিবাহ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ইংলণ্ডদর্শন পরম ইষ্টসাধক। কিন্তু যদি এই অল্পাংশ আপনাদিগের মতানুসারে কার্য্য করে—বিধবা কন্যার বিবাহ দেয় বা ইংলণ্ডে যায়, তবে তাহারা অধিকাংশকর্ত্তৃক সমাজবহিষ্কৃত হয়। ইহা অধিকাংশকর্ত্তৃক অল্পাংশের উপর সামাজিক অত্যাচার।

ইংলণ্ডে অধিকাংশ লোক খ্রীষ্টভক্ত এবং ঈশ্বরবাদী। যে অনীশ্বরবাদী বা খ্রীষ্টধর্ম্মে ভক্তিশূন্য, সে সাহস করিয়া আপনার অবিশ্বাস ব্যক্ত করিতে পারে না। ব্যক্ত করিলে, নানা প্রকার সামাজিক পীড়ায় পীড়িত হয়। মিল্ জন্মাবচ্ছিন্নে আপনার অভক্তি ব্যক্ত করিতে পারিলেন না; ব্যক্ত না করিয়াও, কেবল সন্দেহের পাত্র হইয়াও, পার্লিয়ামেণ্টে অভিষেক—কালে অনেক বিঘ্নবিব্রত হইয়াছিলেন। এবং মৃত্যুর পর অনেক গালি খাইয়াছিলেন। ইহা ঘোরতর সামাজিক অত্যাচার।

অতএব সামাজিক অত্যাচারী দুই শ্রেণীভুক্ত; এক, সমাজের শাস্তা এবং বিধাতৃগণ; দ্বিতীয়, সমাজের অধিকাংশ লোক। ইহাদিগের সামাজিক দুঃখের উৎপত্তি। সেই সকল সামাজিক দুঃখ, সমাজের অবনতির কারণ। তাহার নিরাকরণ মনুষ্যের সাধ্য এবং অবশ্য কর্তব্য। কি কি উপায়ে, সেই সকল অত্যাচারের নিরাকরণ হইতে পারে?

দুই উপায়ে; বাহুবল এবং বাক্যবল।

বাহুবল কাহাকে বলি, এবং বাক্যবল কাহাকে বলি, তাহা প্রথমে বুঝাইব। তৎপরে এই বলের প্রয়োগ বুঝাইব। এবং এই দুই বলের প্রভেদ ও তারতম্য দেখাইব।

কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না যে, যে বলে ব্যাঘ্র হরিণশিশুকে হনন করিয়া ভোজন করে, আর যে বলে অস্তলিজ্ বা সেডান্ জিত হইয়াছিল, তাহা একই বল; দুইই বাহুবল। আমি লিখিতে লিখিতে দেখিলাম, আমার সম্মুখে একটা টিকটিকি একটি মক্ষিকা ধরিয়া খাইল—সিস্‌স্ত্রিস্ হইতে আলেক্‌জণ্ডর্ রমানফ্ পর্য্যন্ত যে যত সাম্রাজ্য স্থাপিত করিয়াছে—রোমান্ বা মাকিদনীয়, খস্রু বা খলিফা, রুস্ বা প্রুস্ যিনি যে সাম্রাজ্য সংস্থাপিত বা রক্ষিত করিয়াছেন, তাঁহার বল, আর এই ক্ষুধার্ত্ত টিকটিকির বল, একই বল—বাহুবল। সুলতান মহম্মদ সোমনাথের মন্দির লুঠ করিয়া লইয়া গেল—আর কালামুখী মার্জ্জারী ইঁদুর মুখে করিয়া পলাইল—উভয়েই বীর—বাহুবলে বীর। সোমনাথের মন্দিরে, আর আমার বস্ত্রচ্ছেদক ইন্দুরে প্রভেদ অনেক স্বীকার করি;—কিন্তু মহম্মদের লক্ষ সৈনিকে, আর একা মার্জ্জারীতেও প্রভেদ অনেক। সংখ্যা ও শরীরে প্রভেদ—বীর্য্যে প্রভেদ বড় দেখি না। সাগরও জল—শিশিরবিন্দুও জল। মহম্মদের বীর্য্য ও টিকটিকি বিড়ালের বীর্য্য, একই বীর্য্য। দুইই বাহুবলের বীর্য্য। পৃথিবীর বীরপুরুষগণ ধনয্! এবং তাঁহাদিগের গুণকীর্ত্তনকারী ইতিবৃত্তলেখকগণ—হেরডোটস্ হইতে কে ও কিঙ্‌লেক্ সাহেব পর্য্যন্ত—তাঁহারাও ধন্য।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, কেবল বাহুবলে কখনও কোন সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় নাই—কেবল বাহুবলে পাণিপাত সেডান্ জিত হয় নাই—কেবল বাহুবলে নাপোলেয়ন্ বা মার্লবর বীর নহে। স্বীকার করি, কিছু কৌশল-অর্থাৎ বুদ্ধিবল—বাহুবলের সঙ্গে সংযুক্ত না হইলে কার্য্যকারিতা ঘটে না। কিন্তু ইহা কেবল মনুষ্যবীরের কার্য্যে নহে—কেহ কি মনে

কর যে, বিনা কৌশলে টিকটিকি মাছি ধরে, কি বিড়া ইঁদুর ধরে? বুদ্ধিবলের সংযোগ ভিন্ন বাহু বলের স্ফূর্ত্তি নাই—এবং বুদ্ধি ব্যতীত জীবের কোন বলেরই স্ফূর্ত্তি নাই।

অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, যে বলে পশুগণ এবং মনুষ্যগণ উভয়ে প্রধানতঃ স্বার্থসাধন করে, তাহাই বাহুবল। প্রকৃত পক্ষে ইহা পশুবল, কিন্তু কার্য্যে সর্ব্বক্ষম, এবং সর্ব্বত্রই শেষ নিষ্পত্তিস্থল। যাহার আর কিছুতেই নিষ্পত্তি হয় না—তাহার নিষ্পত্তি বাহুবলে। এমন গ্রন্থি নাই যে, ছুরিতে কাটা যায় না-এমত প্রস্তর নাই যে, আঘাতে ভাঙ্গে না। বাহুবল ইহজগতের উচ্চ আদালত— সকল আপীলের উপর আপীল এইখানে; ইহার উপর আর আপীল নাই | বাহুবল—পশুর বল; কিন্তু মনুষ্য অদ্যাপি কিয়দংশে পশু, এজন্য বাহুবল মনুষ্যের প্রধান অবলম্বন।

কিন্তু পশুগণের বাহুবলে এবং মনুষ্যের বাহুবলে একটু গুরুতর প্রভেদ আছে। পশুগণের বাহুবল নিত্য ব্যবহার করিতে হয়—মনুষ্যের বাহুবল নিত্য ব্যবহারের প্রয়োজন নাই। ইহার কারণ দুইটি। বাহুবল অনেক পশুগণের একমাত্র উদরপূর্ত্তির উপায়। দ্বিতীয় কারণ, পশুগণ প্রযুক্ত বাহুবলের বশীভূত বটে, কিন্তু প্রয়োগের পূর্ব্বে প্রয়োগ-সম্ভাবনা বুঝিয়া উঠে না। এবং সমাজবদ্ধ নহে বলিয়া বাহুবলপ্রয়োগের প্রয়োজন নিবারণ করিতে পারে না। উপন্যাসে কথিত আছে যে, এক বনের পশুগণ, কোন সিংহ কর্ত্তৃক বন্য পশুগণ নিত্য হত হইতেছে দেখিয়া সিংহের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিল যে, প্রত্যহ পশুগণের উপর পীড়ন করিবার প্রয়োজন নাই—একটি একটি পশু প্রত্যহ তাঁহার আহারজন্য উপস্থিত হইবে। এস্থলে পশুগণ সমাজনিবদ্ধ মনুষ্যের ন্যায় আচরণ করিল,—সিংহকর্ত্তৃক বাহুবলের নিত্য প্রয়োগ নিবারণ করিল। মনুষ্য বৃদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারে যে, কোন্ অবস্থায় বাহুবল প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা। এবং সামাজিক শৃঙ্খলের দ্বারা তাহার নিবারণ করিতে পারে। রাজা মাত্রই বাহুবলে রাজা, কিন্তু নিত্য বাহুবলপ্রয়োগের দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রজাপীড়ন করিতে হয় না। প্রজাগণ দেখিতে পায় যে, এই এক লক্ষ সৈনিক পুরুষ রাজার আজ্ঞাধীন; রাজাজ্ঞার বিরোধ তাহাদের কেবল ধ্বংসের কারণ হইবে। অতএব প্রজা বাহুবল প্রয়োগ সম্ভাবনা দেখিয়া, রাজাজ্ঞাবিরোধী হয় না। বাহুবলও প্রযুক্ত হয় না। অথচ বাহুবল প্রয়োগের যে উদ্দেশ্য, তাহা সিদ্ধ হয়। এ দিকে এই এক লক্ষ সৈন্য যে রাজার আজ্ঞাধীন,

তাহারও কারণ প্রজার অর্থ অথবা অনুগ্রহ। প্রজার অর্থ যে রাজার কোষগত বা প্রজার অনুগ্রহ যে তাঁহার হস্তগত, সেটুকু সামাজিক নিয়মের ফল। অতএব এস্থলে বাহুবল যে প্রযুক্ত হইল না, তাহার মুখ্য কারণ মনুষ্যের দুরদৃষ্টি, গৌণ কারণ সমাজবন্ধন।

আমরা এ প্রবন্ধে গৌণ কারণটি ছাড়িয়া দিলেও দিতে পারি। সামাজিক অত্যাচার যে যে বলে নিরাকৃত হয়, তাহার আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত। সমাজনিবদ্ধ না হইলে সামাজিক অত্যাচারের অস্তিত্ব নাই। সমাজবন্ধন সকল সামাজিক অবস্থার নিত্য কারণ। যাহা নিত্য কারণ, বিকৃতির কারণানুসন্ধানে তাহা ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে।

ইহা বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, এইরূপ করিলে আমাদিগের শাসনের জন্য বাহুবল প্রযুক্ত হইবে—এই বিশ্বাসই বাহুবল প্রয়োগ নিবারণের মূল। কিন্তু মনুষ্যের দূরদৃষ্টি সকল সময়ে সমান নহে—সকল সময়ে বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা করে না। অনেক সময়েই যাঁহারা সমাজের মধ্যে তীক্ষ্নদৃষ্টি, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, এই এই অবস্থায় বাহুবল প্রয়োগের সম্ভাবনা। তাঁহারা অন্যকে সেই অবস্থা বুঝাইয়া দেন। লোকে তাহাকে বুঝে। বুঝে যে, যদি আমরা এই সময়ে কর্ত্তব্য সাধন করি, তবে আমাদিগের উপর বাহুবলপ্রয়োগের সম্ভাবনা। বুঝে যে, বাহুবল প্রয়োগে কতকগুলি অশুভ ফলের সম্ভাবনা। সেই সকল অশুভ ফল আশঙ্কা করিয়া যাহারা বিপরীত পথগামী, তাহারা গন্তব্য পথে গমন করে।

অতএব যখন সমাজের এক ভাগ অপর ভাগকে পীড়িত করে, তখন সেই পীড়ন নিবারণের দুইটি উপায়। প্রথম, বাহুবল প্রয়োগ। যখন রাজা প্রজাকে উৎপীড়ন করিয়া নিরস্ত হয়েন না, তখন প্রজা বাহুবল প্রয়োগ করে। কখনও কখনও রাজাকে যদি কেহ বুঝাইতে পারে যে, এইরূপ উৎপীড়নে প্রজাগণ কর্ত্তৃক বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা, তবে রাজা অত্যাচার হইতে নিরস্ত হয়েন।

ইংলণ্ডের প্রথম চার্লস্ যে প্রজাগণের বাহুবলে শাসিত হইয়াছিলেন, তাহা সকলে অবগত আছেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় জেম্‌স্, বাহুবল প্রয়োগের উদ্যম দেখিয়াই দেশ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু এরূপ বাহুবল প্রয়োগের প্রয়োজন সচরাচর ঘটে না। বাহুবলের আশঙ্কাই যথেষ্ট। অসীম প্রতাপশালী ভারতীয় ইংরেজগণ যদি বুঝেন যে, কোন কার্য্যে

প্রজাগণ অসন্তুষ্ট হইবে, তবে সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। ১৮৫৭। ৫৮ সালে দেখা গিয়াছে, ভারতীয় প্রজাগণ বাহুবলে তাঁহাদিগের সমকক্ষ নহে। তথাপি প্রজার সঙ্গে বাহুবলের পরীক্ষা সুখদায়ক নহে। অতএব তাঁহারা বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা দেখিলে বাঞ্ছিত পথে গতি করেন না।

অতএব কেবল ভাবী ফল বুঝাইতে পারিলেই, বিনা প্রয়োগে বাহুবলের কার্য্য সিদ্ধ হয়। এই প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিদায়িনী শক্তি আর একটি দ্বিতীয় বল। কথায় বুঝাইতে হয়। এই জন্য আমি ইহাকে বাক্যবল নাম দিয়াছি।

এই বাক্যবল অতিশয় আদরণীয় পদার্থ। বাহুবল মনুষ্যসংহার প্রভৃতি বিবিধ অনিষ্ট সাধন করে, কিন্তু বিনা রক্তপাতে, বিনা অস্ত্রাঘাতে, বাহুবলের কার্য্য সিদ্ধ করে। অতএব এই বাক্যবল কি, এবং তাহার প্রয়োগ লক্ষণ ও বিধান কি প্রকার, তাহা বিশেষ প্রকারে সমালোচিত হওয়া কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ এতদ্দেশে। অস্মদ্দেশে বাহুবল প্রয়োগের কোন সম্ভাবনা নাই—বর্ত্তমান অবস্থায় অকর্ত্তব্যও বটে। সামাজিক অত্যাচার নিবারণের বাক্যবল একমাত্র উপায়। অতএব বাক্যবলের বিশেষ প্রকারে উন্নতির প্রয়োজন।

বস্তুতঃ বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবল সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এ পর্য্যন্ত বাহুবলে পৃথিবীর কেবল অবনতিই সাধন করিয়াছে—যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। সভ্যতার যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, যাহারই উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। যিনি বক্তা, যিনি কবি, যিনি লেখক—দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নীতিবেত্তা, ধর্ম্মবেত্তা, ব্যবস্থাবেত্তা, সকলেই বাক্যবলেই বলী।

ইহা কেহ মনে না করেন যে, কেবল বাহুবলের প্রয়োগ নিবারণই বাক্যবলের পরিণাম বা তদর্থেই বাক্যবল প্রযুক্ত হয়। মনুষ্য কতক দূর পশুচরিত্র পরিত্যাগ করিয়া উন্নতাবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। অনেক সময়ে মনুষ্য ভয়ে ভীত না হইয়াও, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত। যদি সমগ্র সমাজের কখনও এক কালে কোনো বিশেষ সদুনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, তবে সে সৎকার্য্য অবশ্য অনুষ্ঠিত হয়। এই সৎপথে জনসাধারণের প্রবৃত্তি কখনও কখনও জ্ঞানীর উপদেশ ব্যতীত ঘটে না। সাধারণ মনুষ্যগণ অজ্ঞ, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে শিক্ষা দেন।

সেই শিক্ষাদায়িনী উপদেশমালা যদি যথাবিহিত বলশালিনী হয়, তবেই তাহা সমাজের হৃদয়ঙ্গমতা হয়। যাহা সমাজের একবার হৃদ্‌গত হয়, সমাজ আর তাহা ছাড়ে না–তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। উপদেশবাক্যবলে আলোড়িত সমাজ বিপ্লুত হইয়া উঠে। বাক্যবলে এইরূপ যাদৃশ সামাজিক ইষ্ট সাধিত হয়, বাহুবলে তাদৃশ কখনও ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

মুসা, ইসা, শাক্যসিংহ প্রভৃতি বাহুবলে বলী নহেন–বাক্যবীর মাত্র। কিন্তু ইসা, শাক্যসিংহ প্রভৃতির দ্বারা পৃথিবীর যে ইষ্ট সাধিত হইয়াছে, বাহুবলবীরগণ কর্ত্তৃক তাহার শতাংশ নহে। বাহুবলে যে কখনও কোন সমাজের ইষ্ট সাধন হয় না, এমত নহে। আত্মরক্ষার জন্য বাহুবলই শ্রেষ্ঠ। আমেরিকায় কোন উন্নতিসাধনকর্ত্তা বাহুবলীর ওয়াশিংটন্‌। হলণ্ড্‌ বেলজিয়মের প্রধান বাহুবলীর অরেঞ্জের উইলিয়ম্‌। ভারতবর্ষের আধুনিক দুর্গতির কারণ–বাহুবলের অভাব। কিন্তু মোটের উপর দেখিতে গেলে, দেখা যাইবে যে, বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবলেই জগতের ইষ্ট সাধিত হইয়াছে। বাহুবল পশুর বল–বাক্যবল মনুষ্যের বল। কিন্তু কতকগুলো বকিতে পারিলে বাক্যবল হয় না।–বাক্যের বলকে আমি বাক্যবল বলিতেছি না। বাক্যে যাহা ব্যক্ত হয়, তাহারই বলকে বাক্যবল বলিতেছি। চিন্তাশীল চিন্তার দ্বারা জাগতিক তত্ত্বসকল মনোমধ্য হইতে উদ্ভূত করেন–বক্তা তাহা বাক্যে লোকের হৃদয়গত করান। এতদুভয়ের বলের সমবায়কে বাক্যবল বলিতেছি।

অনেক সময়েই এই বল একাধারে নিহিত-কখন কখন কখন বলের আধার পৃথক্‌ভূত। একত্রিত হউক, পৃথক্‌ভূত হউক, উভয়ের সমবায়ই বাক্যবল।